অন্ধকার ও রৌদ্রকণাগুলি

বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

বড় বড় হরফে লেখা, 'মেসার্স অশ্বিনী আয়ুর্বেদ ভবন'।

১২, বিপ্লবী মতিলাল ভৌমিক রোড, জয়চণ্ডীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে লেখা,

মৃতসঞ্জিবনী, চ্যবনপ্রাশ সহ সকল প্রকার আয়ুর্বেদিক ঔষধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। সুস্থ সবল শরীর ও মনের জন্য এই সকল ঔষধ সেবন একান্তই আবশ্যক।

কারখানার ভেঙ্গে পড়া গেটের মাথায় লাগানো এই সাইনবোর্ডটি এখনও অক্ষত।

মূল কারখানা ভবনটি ভগ্নপ্রায়। ভূতুরে বাড়ির মতো দেখতে। স্থানীয় পৌরসভা বাড়িটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে, নোটিশ লটকে দিয়েছে লোহার গেটের গায়ে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারী বিভাগের একজন অফিসার কাগজে কলমে পোস্টেড এই কারখানাটিতে। কিন্তু তিনি নিয়মিত আসেন না। যেহেতু কারখানাটিতে কোন কাজ নেই। সারা বছরে বড় জোর দশদিন কাজ হয়। ঐ দিনগুলিতে কারখানার বর্তমান মালিক, বিজয় সামন্ত, ফোন করে অফিসারকে আসার জন্য অনুরোধ করেন। অফিসারের তত্ত্বাবধানে সুরা অর্থাৎ মৃতসঞ্জিবনী তৈরী হয়। কারখানার ভাষায় সুরা জ্বাল দেওয়া হয়।

অফিসার খোঁজ নিয়ে জেনেছেন এই কারখানার শ্রমিকগুলি, বছরের দশ দিন বাদে অন্য দিনগুলিতে অন্যরকম পেশার সঙ্গে যুক্ত।

কেউ রিক্সা চালায়, জনমজুরের কাজ করে কয়েকজন। কেউ বা প্লাস্টিকের খেলনাপাতি বিক্রি করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। গণেশ পাড়ুই নামের একজন শ্রমিক দূর গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষা করতে যায়।

সুরা জ্বালের দিন, এইসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলি একত্রিত হয়ে কারখানায় হাজির হয়।

বিজয় সামন্ত বলে অফিসারকে, এরা স্যার, প্রায়ই এসে খবর নিয়ে যায়।

সুরা জ্বালের বিষয়ে মানুষগুলির অভিজ্ঞতা এবং কাজের ক্ষিপ্রতা দেখে, কখনোই মনে হয় না, সারা বছরের দশ দিন বাদে, অন্য দিনগুলিতে তারা অন্যরকম কাজ করে।

মানুষগুলি যেন কোন যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় রাতারাতি অসম্ভবরকম চাঙ্গা এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

হরিপ্রসন্ন গোঁফে মোচড় দেয়।

বুড়ো মণিলাল ফিরিক ফিরিক করে হাসে।

পেটমোটা দারোয়ান সুরেন মিশির পুরনো ছেঁড়া জলসা পায়ে দিয়ে, মচর মচর শব্দ তুলে, গেট থেকে জ্বালঘর, সেখান থেকে মালিকের ঘরে উঁকি দিয়ে, বুড়ো কবিরাজের ঘরে লম্বা বেঞ্চটায় আরাম করে বসে খৈনী পাকায় আর ঘাড় দুলিয়ে বলে,

কেমোন লাগছে গো, ডাগদারবাবু?

বুড়ো কবিরাজ দাঁতবিহীন মুখে অদ্ভুত শব্দ করে হাসে, আর হাসির ফাঁকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা লালাটুকুকে সুরুৎ করে মুখের ভিতরে টেনে নিয়ে বলে,

সেসব দিন তো আর দ্যাখলা না!

কবিরাজের এই ভারি দোষ। জ্বালের দিনই তার যত পুরনো কথা মনে পড়ে। কারখানার অতীত দিনের, সেইসব কথা বলতে বলতে কবিরাজ এক এক সময় এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, তাকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে।

তার মুখ থেকে কারখানার সেইসব জাঁকজমকপূর্ণ দিনগুলির গল্প শুনতে শুনতে, অন্যদের চোখমুখ যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন হঠাৎই কবিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেসব দিন তো আর দ্যাখলা না।

এই কারখানায় কবিরাজ সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী। ঢাকায় কারখানার জন্মলগ্ন থেকে কবিরাজ যুক্ত রয়েছে কারখানার সঙ্গে।

জ্বালঘরের পাশেই রিসিভিং রুম। আর তার কোলে সরকারী অফিসারের ঘর। পুরনো আমলের উঁচু ছাদওয়ালা ঘর। ঘরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গিয়ে, নির্মমভাবে বাল্বের আলোকে শুষে নিচ্ছে। তার ফলে কাঠের টেবিল চেয়ার, এক পাল্লা ভাঙ্গা আলমারি এবং তার মাথায় রাখা বান্ডিলবাঁধা পুরনো সরকারী রেজিস্টার কাগজপত্র, সব কেমন বিবর্ণ ম্যারমেরে দেখতে লাগে।

অফিসারের ঘরের মাঝ বরাবর দেওয়াল তুলে, তার গায়ে ছোট একটি দরজা ফুটিয়ে, দরজার মাথায় টিনের প্লেট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে — 'স্টোর রুম'।

স্টোর রুমের ভিতরটি দিনের আলোতেও অন্ধকার। আরশোলা টিকটিকি আর মাকড়সায় ভর্তি। বড় বড় কাঠের র‍্যাকগুলিতে ধুলোর পুরু আস্তরণ।

যে কেউ স্টোর রুমে ঢোকার আগে বারকয়েক হাততালি দিয়ে, টর্চের আলো ফেলে দেখে নেয় ভেতরটা।

বিজয় সামন্ত প্রায়ই বলে, এবার বর্ষাটা পার হলেই স্যার, বাড়িটায় হাত লাগাব। একটু থেমে বলে, এর জন্যে কি কমিশনার সাহেবের কাছে পারমিশান নিতে হবে?

অফিসার টেবিলে পেন ঠুকতে ঠুকতে বলেন,

আমাকে নিয়ে কজন অফিসারকে এই একই স্তোকবাক্য শুনিয়েছেন, বিজয়বাবু?

— আপনার আগের জনের সময়ে! বিজয় সামন্ত দ্রুত জবাব দেয়, অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। তার আগের সময়ে তো ফ্যাক্টরী টিপটপ। প্রতিদিন জ্বাল হোত। র‍্যানিং ভ্যাটে মালও হোত প্রচুর। একটু চুপ করে থেকে বলে, আপনার এই ঘরের দরজায় তখন ভারি পর্দা ঝুলত। একটা গদি আঁটা ইজিচেয়ারও ছিল। কে যে সরিয়ে নিল সেটা?

বিজয় সামন্তের আফশোষের সুরে গলা মিলিয়ে অফিসার বলেন, সান্ত্বনা তো ওটাই। ছিল সব। আমার আগের জনেরা সে সবের সুখ পেয়ে গেল। আমার পরের জন হয়ত, এই নড়বড়ে চেয়ার আর পেরেক ওঠা টেবিলের আরামটুকুও পাবে না।

বিজয় সামন্ত হেঁ হেঁ করে হাসে।

সুরার তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ঠোঁটকাটা সুবল জ্বালঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

আবগারী কনস্টেবল সুভাষ বলে, মাল আসতে দেরী হবে। জোলো কাঠ। স্টীল তাততে অনেক সময় নিয়ে নেবে।

অফিসার বলেন, চলো সুভাষ, বাইরে গিয়ে বসি।

বাইরে ফটফটে রোদ। কবিরাজের ঘরের পাশের ছোট পুকুরটির চারপাশ ঘিরে বড় বড় গাছ। গাছগুলির নীচে নরম ছায়া। পুকুর থেকে লম্বা পাইপে জল এসে পড়ছে কনডেনসারের ওপর। পুকুরের জল নেমে গেছে বলে, বিজয় সামন্ত পুকুর পাড়ে ছোট পাম্প বসিয়েছে। একটানা ফটফট আওয়াজ করে, পাম্প জল টেনে তুলছে।

গণেশ পাড়ুই কারখানার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারী। বিজয় সামন্ত তেমনটাই বলে।

গণেশের চেহারা দেখে বয়স বোঝা ভার। রোগা শুঁটকো। সুরা জ্বালের দিন, আন্ডারওয়্যারের ওপর এক ফালি গামছা জড়িয়ে, উদোম গায়ে পুকুর পাড়ে পায়চারী করে গণেশ। আর তীক্ষ্ণ চোখে জলের পাইপটিকে দেখে। সেটি কাজের ধকলে কাঁপতে কাঁপতে সামান্য নীচু হয়ে গেলে বা আড়কাঠির মতো স্ট্যান্ড থেকে, একচুল এপাশ ওপাশ হয়ে গেলে, চোখের নিমেষে গণেশ পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিশোরের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে চলে যায় পুকুরের মাঝ বরাবর। তারপর পাইপটিকে ঠিক করে দিয়ে, অলস ভঙ্গিমায় সাঁতরাতে সাঁতরাতে পাড়ে চলে আসে।

তখন তার সারা শরীরে পাঁকের পাতলা প্রলেপ পড়ে যায়। আর পাড়ে উঠেই সে ক্ষ্যাপার মতো গা হাত পা চুলকোতে থাকে। এমনকি তার চুলবিহীন মাথাটিও। গণেশের কাছাকাছি দাঁড়ালেই, পাঁকের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়।

তার বউ, এই গা-বমি দেওয়া গন্ধ সত্ত্বেও, রাতের বেলায় তার কতটা কাছে আসতে পারে, এই নিয়ে কারখানার দু চারজন বিচ্ছিরি আলোচনায় গণেশকে উত্যক্ত করে মারে।

গণেশ গা চুলকোয় আর মিটমিট করে হাসে। কোনসময় বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আমার বউ তোদের কাকিমা রে। কিম্বা অফিসারের ঘরের দিকে চেয়ে হঠাৎই চেঁচিয়ে ওঠে,

স্যার, কিছু বলছেন নাকি?

মুহূর্তে সব হাসিঠাট্টা চুপ।

গণেশ তখন নিজের মনেই হাসে। তারপর পুকুরপাড়ের বড় নিমগাছটির আড়ালে গিয়ে, কোমর থেকে গামছাটি খুলে, ভাল করে নিঙরে, বাতাসে বার দুই আছড়ে, আবার সেটিকে কোমরে জড়িয়ে নেয়।

বুড়ো মণিলাল বিশাল মাপের হামানদিস্তাতে, কি শক্তিতে যে মশলা পেটে, অফিসার ভেবে পান না। কনস্টেবল সুভাষ বলে, গোটা কারখানায়, ওর মতো গরীব আর কেউ নেই।

মণিলাল তার ন্যুব্জ শরীরটিকে কোনরকমে সোজা করে, অফিসারের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে নীচু গলায় বলে,

আজ একটু সুরা দিবান তো, স্যার?

অফিসার কোন জবাব দেন না।

সুভাষ বলে, এই বয়সে টাল সামলাতে পারবে তো?

মণিলাল অপরাধীর মতো মুখ করে হাসে।

অফিসার দেখেন, গণেশ পাড়ুই আসছে তাঁর ঘরের দিকে। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে, লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে পুকুরের ওপার থেকে।

অফিসারের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গণেশ। ঘাড় দুলিয়ে বলে, আর একটু জোরালো পাম্প বসালে, জলের ফোলো ভাল হোত। মালটাও বেশী পাওয়া যেত।

সুভাষ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, মাল আজ ভাল হবে না গণেশদা। স্যারকে আগেই বলেছি।

গণেশ চমকে ওঠে, কেন? কেন?

— কাঠের অবস্থা দেখছো না! বলে সুভাষ জ্বাল ঘরের দিকে তাকায়, দেখো, এখনও স্টীলের নীচে ধোঁয়া। জোলো কাঠ।

গণেশ তার চুলবিহীন মাথাটিতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, সক্কালে স্যার, ভ্যাটে

উঁকি দিয়ে দেখি, একটি দুটি ফুট। মাল নিথর। মালিক থার্মিটার ডোবানোর আগেই বললাম, হাজার দশের নীচে নেমে গেছে। আমার কথা স্যার নিঘ্ঘাৎ। সুভাষদা যাই বলুক না, মাল খারাপ হতে পারে না।

গণেশকে সামান্য উত্তেজিত দেখায়, আগে এই কারখানায় যে ম্যানেজার সাব ছিলেন, থার্মিটার দিত না। আমাকে দেখতে বলত। আমি জিবে ঠেকিয়ে যদি বলতাম ঠিক আছে, তো মাল স্টীলে উঠত।

কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে আপনিই থেমে যায় গণেশ। তারপর খুক খুক করে হেসে বলে, রগড়টা দ্যাখেন স্যার।

অফিসার বিস্মিত গলায় বলেন, কি?

— এরে কয় জ্বালের দিনের পিরিত। চোখ মটকে কথাটি বলেই, গণেশ কারখানার গেটের দিকে চলতে থাকে। তার চলার পথের দিকে সটান চোখ রেখে অফিসার দেখেন, মালিক বিজয় সামন্ত, দারোয়ান সুরেন মিশিরের গলা জড়িয়ে ধরে কথা বলছে। এতদূর থেকে তাদের কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না। শুধু দমকা হাওয়ার মতো তাদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে।

কনস্টেবল সুভাষের থেকে অফিসার জানতে পেরেছেন, প্রতিবার জ্বালের খরচের টাকা, সুরেন মিশির চড়া সুদে ধার নিয়ে আসে দেশওয়ালী কোন দাদার থেকে। তার ওপর সুদ চড়িয়ে, সেই টাকা মালিক বিজয় সামন্তকে ধার দেয়। প্রতি জ্বালে মালিক লুকিয়ে তাকে একটি বোতল দেয়।

তারপর দিন দুই পরে নেশা ছুটে গেলেই, সুরেন মিশির তাড়া লাগায় মালিককে, টাকা শোধ দাও।

টালবাহানায় মিশিরের মেজাজ চড়তে থাকে। তখন আসল ছেড়ে সুদ চায়। প্রতিদিনের হিসেবে সুদ।

অবস্থা চরমে উঠলে, মালিককে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে।

তারপর ধার শোধ হয়ে গেলে, আবার সব ঠিক হয়ে যায়। জ্বালের আগে আবার আগের বারের মতোই, সুরেন টাকা ধার নিয়ে আসে। মালিককে দেয়।

জ্বালের দিন, পুরনো জলসায় আওয়াজ তুলে, সুরেন খুশিতে টগবগ করে ঘুরে বেড়ায় সারা কারখানা জুড়ে।

জ্বালের দিনে, মালিকের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই সুরেন মিশিরের।

দুপুরের সামান্যক্ষণ পরেই রিসিভারে মাল আসতে শুরু করল। একজন দুজন করে, কারখানার সকলেই উঁকি দিয়ে দেখে গেল রিসিভিং রুমের দিকে।

মালিক বলল, স্ট্রেনথ্‌টা একবার দেখলে হোত না, স্যার?

অফিসার বললেন, এত তাড়াতাড়ি? টিফিনটা হয়ে যাক না।

মালিক হেসে বলল, এ কারখানায় টিফিন আওয়ার্স বলে কিছু নেই স্যার।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, সকলেই বাড়ি থেকে খেয়ে আসে। আবার রাতে বাড়ি ফিরে খায়। টিফিন করার সঙ্গতি কোথায়?

অফিসার বললেন, দেখুন না হয় স্ট্রেনথ্‌টা।

মালিক ডাকে হরিপ্রসন্নকে। হরিপ্রসন্নের সঙ্গে সঙ্গে রতনও আসে।

ঘরের দরজায় বুড়ো মণিলাল, দায়োরান সুরেন মিশির, ঠোঁটকাটা সুবল, এমনকি কবিরাজ, সবাই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে, উৎকণ্ঠিত মুখে ভেতর দিকে চেয়ে থাকে। যেন কোন উৎসব শুরু হয়েছে।

মালিক প্রথমে ডিপ কাঠি ফেলে মাল মাপে। তারপর হরিপ্রসন্ন লম্বা একটি কাঠি দিয়ে, স্টীলের মধ্যেকার মাল নেড়ে দেয় বেশ করে।

রতন স্টীলের নীচের কল খুলে, লম্বা কাঁচের সিলিন্ডারে সুরা ভরে নেয় খানিকটা।

মালিক ভিড় সামলানোর গলায়, 'সরে যাও', 'সরে যাও' করতে করতে, রতনের হাত থেকে সিলিন্ডারটি ছিনিয়ে নিয়ে, অফিসারের সামনের টেবিলে এনে বসায়।

সিলিন্ডারের গায়ে আস্তো হাত বুলিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসে, টেমপারেচার বেশ উঠে গেছে স্যার। কাজ শেষ হতে খুব দেরী হবে না।

টেমপারচার, তারপর ইন্ডিকেশন দেখে, চার্ট বই খুলে, অফিসার বলেন,

আর ঘণ্টা তিন, বড় জোর।

দরজার বাইরে সমস্বরে ফিসফিসিয়ে ওঠে, এখনও তিন ঘণ্টা।

কবিরাজ ফিরে যায় তার ঘরে। মণিলাল আবার গিয়ে বসে বিশাল হামানদিস্তাটির সামনে। দারোয়ান শিস দিতে দিতে চলে যায়, গেটের পাশে তার ঘরের দিকে। হরিপ্রসন্ন আর ঠোঁটকাটা সুবল, অফিসারের সামনে ছোট ঘুপচিমত ঘরটায় দড়ির খাটিয়ায় গিয়ে বসে। আর নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে গল্প করে।

ইতিমধ্যে অফিসারের জন্য এক ডিস মিষ্টি নিয়ে আসে, কারখানার সবচেয়ে কমবয়সী কর্মচারীটি।

তার কোমল মুখের দিকে চেয়ে, অফিসারের মনে পড়ে যায় মালিকের কথাগুলি, এ কারখানায় টিফিন আওয়ার্স বলে কিছু নেই।

অফিসারের মনটি বিষণ্ণ হয়ে যায়।

সহায় সম্বলহীন কয়েকটি মানুষ, রুগ্ন মৃতপ্রায় এই কারখানাটিকে ঘিরে, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে।

সুরা জ্বালের দিন, সুরার তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধে যখন তাদের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে, তখন তাদের সেই স্বপ্ন একটি অন্যরকম মাত্রা নিতে থাকে।

সুরা জ্বালের দিন, যেন কারখানাটির নবজন্মের দিন, এমনি বিশ্বাসে চনমনিয়ে ওঠে মানুষগুলি।

মালিক বিজয় সামন্ত প্রায়ই বলে অফিসারকে, সরকারী শিল্প দপ্তরের পর্যবেক্ষক দল এই কারখানাটি পরিদর্শন করতে আসবে। তারা কারখানাটির রুগ্নতার কারণগুলি খতিয়ে দেখবে। পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করবে।

স্থানীয় এম.এল.এ., পর্যবেক্ষক দলের মতামতের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজয় সামন্ত এই সংক্রান্ত কিছু চিঠিপত্র, অফিসারকে দেখিয়েছে।

আপন মনেই মাথা দোলান অফিসার। লম্বা শ্বাস পড়ে তাঁর। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে, আনমনার মতো দেখেন কারখানাটি। কারখানাটির সারা শরীর জুড়ে দগদগে ঘায়ের মতো ক্ষত। অরিষ্টের বিশাল হাঁড়িগুলি ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ঘাস আগাছায় ভরে গেছে চারপাশ। ছোট একটি ছাগলছানা, কি ভাবে গেটের পাশের থামের মাথায় উঠে, আগাছা চিবোচ্ছে। লোহার গেটটি ঝুলে পড়েছে একধারে।

বড় বড় টিনের শেডগুলির নীচে, গরু মোষ বেঁধে রাখে বিহারী গোয়ালারা। মাটির ডাবার পরিবর্তে, কারখানার পরিত্যক্ত পিতলের হাঁড়িতে জাবজল খায় তারা।

আজ সুরা জ্বালের দিন। তাই কারখানাটি মুখর। অন্যদিন কারখানাটি কবরখানার মতো নিশ্চুপ।

অফিসার ভাবেন, যদি এমনই কোন সুরা জ্বালের দিনে পর্যবেক্ষক দলটি আসে, যখন সুরার তীব্র গন্ধে, পাম্প চলার একটানা শব্দে, হাস্যোজ্জ্বল কিছু মুখের ভিড়ে, কারখানাটি সজীব সরব, যখন টেবিলের ওপর বসানো কাঁচের সিলিন্ডার ভর্তি তপ্ত সুরা, থার্মোমিটার, ইন্ডিকেশন বই, এ সবের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে সম্ভাবনার বীজ, যদি এমনই কোন দিনে ...!

— স্যার?

অফিসার ঘাড় ফিরিয়ে তাকান।

— এখনও খাননি টিফিনটা? সংকুচিত গলায় বিজয় সামন্ত জিজ্ঞেস করে।

তারপরেও কয়েক মুহূর্ত অফিসারকে নিশ্চুপ দেখে, ধীর গলায় থেমে থেমে বলে, আপনার টিফিন করা হয়ে গেলে, আর একবার দেখবেন নাকি স্ট্রেনথ্‌টা?